ভূমিকা

ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি ঘুমিয়ে থাকে, সে হয়তো একদিন নির্দিষ্ট পরিসরের পূর্বাভাস ডেকে দিয়ে জেগে ওঠার মন্ত্রে আনবে আপন নবজাগরণ। তাই জ্বলে ওঠার দীর্ঘ অবসানে তার দীর্ঘ ঘুমের বিরতি প্রয়োজন হয় কখনও কখনও। সাহিত্যে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির গভীরে অন্বেষণ করলে অনুধাবন করি সেখানে চাপ ও রৌদ্রদগ্ধ তাপের বিপরীতে রাজত্ব করে চলেছে হিমশীতল নিষ্প্রাণ একটি আবর্ত। আবার জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির প্রখর দাবদাহে এই 'হিমশীতল নিষ্প্রাণ একটি আবর্তনে'র অবদান কোনো অংশে কম নয়। আসলে সময় তার নিয়তি নির্ধারিত গতিপথে নির্বাচন করে রাখে আগ্নেয়গিরির জ্বলে ওঠার প্রকৃত দিনক্ষণ। মৃত্তিকার অব্যর্থ আবরণ ভেদ করতে না পারা অসহ্য তীব্র চাপ আর চলমান রৌদ্র দিনের বিধ্বংসী তাপ হাজির করায় আগ্নেয়গিরির আগমন বার্তা। আরও স্পষ্ট করে বললে একজন প্রকৃত রচয়িতার উত্থানের প্রসঙ্গ উঠলে যদি সত্যি সত্যি তাঁহার জীবনচরিতে খুঁজিতে যাই তাহলে ঘুমন্ত এবং জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির নীরব ইতিহাস অবধারিতভাবে ধরা পড়বে। কেননা, রচয়িতার মন ও মননে জ্বলে ওঠার উপকরণ কোনো না কোনোভাবে তিলে তিলে বেড়ে ওঠে ছেলেবেলার অনির্দিষ্ট ভাগ্যলিপিতে। বহন ও ধারণের ভাগ্যলিপি জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আর দশজন মানুষের ব্যবধানে গিয়ে সে একদিন এভাবেই অঙ্কন করতে চায় তাঁর জীবনপর্বের প্রত্যক্ষ ইতিহাস। অভিজ্ঞতার ভাষা দিয়ে বোঝাতে চায় সমাজে দেখা দৃশ্যের ন্যায় সেও এঁকেছে সাহিত্যে অনুভূতির আর এক হুবহু দর্পণ। জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির উত্থান ঘটে এভাবেই। একজন প্রকৃত রচয়িতার উত্থানও ঘটে ঠিক একইভাবে। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি সত্তার দীর্ঘ অবসর অতিক্রম করে।

জাগরণের একটা অভিযান বাংলা সাহিত্যে শুরু হয়েছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের আগমন এবং অনুশীলনে। উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকের সাহিত্যচর্চার ধারা বাংলা সাহিত্যকে সেদিন নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছিল নিঃসন্দেহে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবধারা একসময় বাংলা সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রেরণা স্বরূপ মাধ্যম হয়ে উঠলেও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে সাহিত্যে আত্মপরিচয়ের উচ্ছ্বাস ফেটে পড়তে সময় লাগল না বেশিদিন। বিশ শতকের আগমন

ওলোট-পালোট করে দিল সবকিছুই। বিশেষত উনিশ শতকীয় ছোটগল্পের পরিভাষায় সাংঘাতিকভাবে রদবদল ঘটল। এই বিপ্রতীপ অবস্থানের মূলে ছিল বিশ শতকব্যাপী অস্থির সময়ের কিছু আন্দোলন। তুলনামূলক ভাবে প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে আমরা তার রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। পাশ্চাত্য আন্দোলনের ধরণ দেখে যদিও প্রাচ্যের আন্দোলনগুলি আমরা ঘটতে দেখেছি। তবে হ্যাঁ, উনিশ শতকীয় কাহিনি নির্ভর ছোটগল্পের প্রথা বিশ শতকের দোরগোড়ায় খসে খসে পড়ল। গল্পে এল উপস্থাপনার নবজাগরণ। গল্পে কাহিনির একঘেয়েমি থাকল না। গল্পের শুরু, শেষ বা চরিত্রের উপস্থিতিতে পরিকল্পনা মাফিক সমাপ্তির নিশ্চয়তা এলোমেলো হয়ে গেল। পাঠক আর ছোট গল্পলেখকের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি হল নব নব রূপে।

আলোচ্য ভূমিকাংশে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তিনিই বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক স্রষ্টা। কিন্তু তারপর, সার্থক ছোটগল্পকে নদীর প্রবাহমানতার মতো সুদীর্ঘকাল এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মোটেই সুখের অভিজ্ঞতা ছিল না। পরপর দুই বিশ্বযুদ্ধের আঘাত, স্বাধীনতা আন্দোলনের আহ্বান, তারও পূর্বে পরাধীনতার হীনতা, বা পরবর্তীকালের স্বাধীনতা অর্জন, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ষাটের দশকের 'হাংরি জেনারেশন', 'শাস্ত্র বিরোধী সাহিত্য আন্দোলন', 'এই দশক আন্দোলন', 'নিম্ন সাহিত্য আন্দোলন' প্রভৃতি দুঃসময় অতিক্রম করতে হয়েছে বাংলা ছোটগল্পকে। বহু আন্দোলনের চাপে ও তাপে সেদিন অনেক জীবনকে হাতে কলম তুলে নিতে হয়েছিল। তাঁদের চোখের সামনে বয়ে চলা অস্থির সময়ের দিনলিপিকে সেদিন এড়িয়ে যেতে পারেননি অনেকেই। সেই সময়ের প্রবাহমান সময়কে প্রতিচ্ছবি হিসেবে ভাষা দিতে তাঁরা হলেন বদ্ধপরিকর। বাতে-অজ্ঞাতে রবীন্দ্র ভাবধারা ও রবীন্দ্র-প্রত্যয়ের বিপরীত স্রোতে হাঁটার সঙ্কল্পে নতুন গতিপথ খাড়া হল দ্রুততার সাথে। অন্তর্গত রক্তের ভেতর মূলগত জীবন প্রেরণা এবং লেখকসত্তার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছতে সময়ও অতিবাহিত হয়েছিল খানিকটা। গোটা পৃথিবীর মতোই সারা বাংলা জুড়ে দুই বিশ্বযুদ্ধের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক আঘাত আছড়ে পড়ে। ফল স্বরূপ, মানব জাতির স্বাভাবিক জীবন অভিজ্ঞতায় নেমে এসেছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমান মহাবিপর্যয়। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির গতানুগতিক পথ পরিবর্তন একই

সাথে নতুন গন্তব্যের সন্ধানে শূন্যতার স্থানে তাগিদ এবং মৌল বাসনাতেও সৃষ্টির নতুন আক্ষেপ দেখা দিতে শুরু করে।

দৃষ্টিকোণ এবং বিষয়বস্তুর নতুনত্ব লেখক জীবনের শুরুতেই একঝাঁক প্রতিশ্রুতিমান তরুণ গল্পকারদের প্রকাশভঙ্গিতে উঠে এল। একটু দেরীতে হলেও মহাশ্বেতীদেবী সাহিত্য জীবনে একদিকে মহিলা রচয়িতা এবং অন্যদিকে সৃষ্টির অভিযান প্রক্রিয়ায় বিপ্লবই ঘটিয়ে গেলেন। তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য জীবন তথা ছোটগল্পে দেখা গেল মানবজীবনকে খুব নিকট থেকে দেখার নির্ভেজাল দর্শন, তাদের মুখে ভাষাও হয়ে উঠল তেমনি জীবন্ত। সবমিলিয়ে বাংলা ছোটগল্পের দিক পরিবর্তনের এক বিশেষ সময়ের বিশেষ কাণ্ডারী বলা যায় তাঁকে। সময়ের বাঁকে আসতে সময় ব্যয় করলেন না গল্পকার মতি নন্দীও। আমরা জানি, রবীন্দ্র-শরৎ-তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প আবহ গ্রহণ করে এবং নতুন গতিপথ অন্বেষণে মতি নন্দীর ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আবার অমিয়ভূষণ মজুমদার উপন্যাস নির্মাণ রীতির মতো ছোটগল্পেও নিজস্ব গল্পকার সত্তা প্রকাশে ছিলেন আশ্চর্য রকমভাবে সাবলীল। তাঁর গল্পকার সত্তার নিজস্ব ঘরানা তৎকালীন সময়েই বিশেষ মর্যাদার দাবি রেখেছিল। 'কুবেরের বিষয়-আশয়'-এর রচয়িতা শ্যামল গঙ্গোপাধযায় পঞ্চাশ পরবর্তী গল্পজীবনের ধারাকে মারাত্মকভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। গল্প লেখার গভীরতা এবং বিষয়-নির্বাচনে তাঁর ভাবুক মনের দোসর পাওয়া আজও তেমনি হয়ে থাকল দুর্লভ। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একইভাবে গতানুগতিক অতীতের মুখোমুখি না হয়ে এগিয়ে চললেন সমকালীন গতিবাদের অনুকূলে। সময় সমাজের বদলে যাওয়া আবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে জীবনকে খুব কাছ থেকে ধরতে পেরেছেন গল্পকার সাধন চট্টোপাধ্যায়। ধরতে পেরেছেন কালের দ্বিধা-সংশয় জড়িত বর্তমান যাপনে অভ্যস্ত মানুষের ভারসাম্যকে। নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তার দোলাচলে যে মানুষ কখনও বিজয়ী হয়, কখনও পরাজিত হয়।

আমাদের আলোচ্য যেহেতু গল্পকার দেবেশ রায় তাই ভূমিকাংশ তাঁর সমসাময়িক গল্পকারদের বিস্তারিত আলোচনা না করে তাঁর আলোচনায় প্রবেশ করেছি। বাংলা ছোটগল্পে পালাবদলের সেই ক্রান্তি লগ্নে ছোটগল্পের ভাষারীতি, প্রকরণ কৌশল, গঠন নির্মিতির ব্যতিক্রমী দীপ জ্বালিয়ে 'হাড়কাটা' গল্পের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন গল্পকার দেবেশ

রায়। প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহন করে তিনি আজ বাংলা ছোটগল্পকে এক ভিন্নতর উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। এতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে দীর্ঘজীবন নিরলসভাবে সাহিত্যের প্রতি অগাধ ভালবাসা আর অসম্ভব দায়। আর এই দায়ভারকে অন্তরের গভীরে নিজের লেখক সত্তার প্রতি যত্ন ও তাঁকে দিয়ে নানা ভঙ্গিতে অনুশীলন এবং অসম্ভব রকমের এক মগ্নতাতাকে আবিষ্কার করেছিল আর তিনি সর্বদা সচেতন থেকে নির্মাণ করে গেছেন গল্পের বৃহত্তর ভুবন। এই একমুখী মগ্নতার চরিত্র কাল ভেদে বিবিধভাবে ধরা দিয়েছে। ছাত্র জীবনে রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার দিনগুলো অতিক্রমের ব্যস্ত সময়ে তাঁকে 'হাড়কাটা'র মতো গল্প লিখতে দেখা গেছে। অথচ বেশিরভাগ গল্পকারদের ক্ষেত্রে দেখি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে তাঁরা নির্মাণ করে থাকেন তাঁদের স্বরচিত আত্মকথা। দেবেশ রায় লেখক জীবনের শুরু থেকে গল্পকার সত্তার নির্মাণ-বিনির্মাণের পথ বদল করেছেন এভাবেই। ছাত্র রাজনীতির স্বল্প বয়েসী তেজে রাজনীতিমূলক গল্প তাঁর কাছ থেকে না পেয়ে আশ্চর্য রকমভাবে পেলাম রাজনীতির আন্দোলন মুখীনতার সঙ্গে বৃহত্তর রাজনৈতিক ভাবনার সেতু বন্ধন। ছাত্র রাজনীতির প্রভাব হয়তো ছোটগল্পে রাজনৈতিক ছায়ার আবহকে স্পর্শ করতে পারেনি তবে, ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে ব্যক্তির সম্পর্ক অনুসন্ধানের ভিত্তিটা তৈরি করছিলেন অবচেতনে। প্রত্যক্ষভাবে পরখ করে নেওয়ার উপলব্ধি বোধহয় এমতাবস্থায় বেশি কাজ করেছিল এসময়। স্বভাবতই, দেবেশ রায়কে কোনো নির্দিষ্ট পরিসরের বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে তাঁর গল্পকার সত্তার প্রকৃত মূল্যায়ন করা যাবে না। স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি প্রতিবারই গল্প রচনার দৌলতে আপন নির্মাণকে অতিক্রম করে যান। অর্ধ-শতাব্দীর ওপর লিখে চলা তাঁর প্রবাহমান অনুশীলনে সময় হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে তাঁর এক একেকটি ছোটোগল্পকে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে' মহাকাব্যসুলভ চিন্তার বিকাশে যে বৃহত্তর জীবনের হদিশ তিনি দিয়েছেন। তার মানে এই নয়, এ উপন্যাস থেকেই বৃহত্তর জীবন প্রকাশ করার প্রথম দৃষ্টি শুরু এখান থেকে। বরং প্রথম জীবনের গল্প ভাবনার তরছ ধরে এগোলে দেখা যায় প্রত্যেকটি গল্পের ব্যক্তিগত পরিভাষায় কোথাও যেন বৃহত্তর জীবনের একটা অস্তিত্ব নিজস্ব আবেদন রাখতে চায়।

যত্নশীলতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিজের সাথে নিজের দ্বন্দ্বকে কখনই থামতে দেখা

যায়নি দেবেশের মধ্যে। উল্লেখ্য, তাঁর প্রত্যেকটি গল্প গভীরভাবে অনুধাবন করলে মনে হয়, খাঁটি কৃষকের মতো মৃত্তিকা পরীক্ষা করে তিনি তাকে ফসল ফলানোর উপযুক্ত করেন। তিনি দার্শনিকের মতোই প্রত্যক্ষভাবে চোখে দেখার অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী, তিনি ভাবুকের মতোই আগামী কালের হস্তরেখা বিচারে পারদর্শী এবং তারও পরে তাঁর রচনা শক্তির মধ্যে নিবিড় জীবনাভিজ্ঞতার একটা বড় প্রভাব দৃশ্যত বা অদৃশ্যভাবে তাঁর রচনাকে ছুঁয়ে থাকে বলে মনে হয়। তত্ত্ব এবং তথ্যের ফাঁকফোকরে দেবেশের অবহেলা বোধহয় কোনদিনই লক্ষ করা যায়নি। বরং সাদা-মাটা একটি গল্পের শরীরে হাত বুলিয়ে দেবেশ বদলে দিতে পারেন সেই রুগ্ন গল্পের চেহারা। দেবেশ রায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনে যত পরিণত হচ্ছেন সাহিত্যের বিবিধ শাখায়, তার গভীরতা লক্ষ করা যাচ্ছে সাহিত্য বিবিধ শাখায় তার গভীরতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

ভাগ্যের ওপর হাল ছেড়ে দিয়ে বিধিলিপি নিয়ে পড়ে থাকার মতো আস্থাহীনতায় ভোগা মানুষ দেবেশ রায়ের গল্পে তেমন একটা নেই বললেই চলে। ইতিহাসে সম্পূর্ণ ঘটে যাওয়া সত্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে তাঁর গল্প, গল্পের বিষয়বস্তু। পরবর্তীকালে বিমল কর, জগদীশ গুপ্ত, কমলকুমার মজুমদার আশ্চর্য দক্ষতায় বাংলা ছোটগল্পের গতিপথ বদলে দিতে পেরেছেন মাথার উপর বড় বড় সার্থক ছোটগল্পকার থাকা সত্ত্বেও। এর পরে যদি দেবেশ রায়ের কথা ওঠে তাহলে বলব বিমল কর, জগদীশ গুপ্ত, কমলকুমার মজুমদারদের মতো তিনিও ইউরোপীয় ধারার ধার না ধরে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় বলয়ের মধ্যে নির্মাণের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। 'হাড়কাটা' গল্প রচনার মধ্যদিয়ে তাঁর প্রথম পর্বের গল্প রচনার শুরু। এই পর্ব থেকে তিনি ওতোপ্রোতভাবে ভারতীয় প্রকরণ ও আদর্শের সাধনা করে গেছেন। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বাংলা সাহিত্যের অক্লান্ত অনুশীলনে প্রথম জীবনের রচনার মতো একইরকম অন্বেষণের দায়, ঐতিহ্য, নদীর বহমানতার ন্যায় সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে। তাঁকে ব্যক্তি অনুসন্ধানের পথে ব্যক্তিকে মাধ্যম করে ইতিহাসের অবিরাম অনুসন্ধান করতে দেখা যায়। সেই একই পথে গল্পের মধ্যে দানা বাঁধে একাধিক বৈশিষ্ট্য। সবাক বাস্তবতাকে ছোটগল্পের চেহারায় তিনি রূপ দিলেন দেশীয় বর্ণনার ঘেরাটোপে, রূপকের যথাযোগ্য ব্যবহারে সর্বোপরি, দেবেশ রায় স্টাইল প্রয়োগে সেখানে গল্পের প্রাণ

সঞ্চারে প্রকৃত ভারতীয় 'মডেল' গল্পের আঙিনায় পৌঁছে দিল।

আবারও বলছি, কোনো গল্পকে নির্দিষ্ট আয়তনের গণ্ডীতে বেঁধে তাকে ছোটগল্প হিসাবে ঘোষণা করা তাঁর পক্ষে সাংঘাতিকভাবে আপত্তিকর বলে বিবেচিত হয়েছে। গল্পে ভাঙাগড়ার খেলায় তিনিই বোধহয় একটু অন্যভাবে বলতে চেয়েছেন, পরিসীমার বাইরেও ছোটগল্প আকারে বড় হলেও সে তার নিজস্ব সুষমা সৌন্দর্য হারাবে না। গল্পের কনটেন্টই তার অনিশ্চিত নির্দিষ্ট আয়তনে নিয়ে যাবে। গল্পের জাতে থাকবে তবু একই রকমভাবে প্রবাহমানতার প্রাণ। যা আমরা রক্তে মেশানোর মতো গ্রহণ করেছি। দেবেশের নির্মাণ রীতি বা গল্প নির্মাণ প্রকৃতির অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হল বর্ণনার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা ভাস্কর্য ধর্ম। চরিত্র, কাহিনি বা গল্পের বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির মাঝে মাঝে ছোটগল্প নির্মাণের যে কৌশল ব্যবহার করেন তাতে অসম্ভব রকম যত্ন থাকে, ঠিক যেমন একজন চিত্রশিল্পী করে থাকেন। শেষ পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হয়ে উঠা গল্প পাঠকের মনে-মননে ছবির মতো ভেসে ওঠে, জীবন্ত আবহে বিচরণ করতে করতে যা বিস্মিত করে।

দেবেশ রায় একজন সার্থক ছোটগল্পকার হিসেবে পরিচিত নন, উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ লক্ষিত হয়। প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর অসামান্য মেধা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দেবেশ রায়ের সাহিত্যচর্চার বিরাট প্রাঙ্গণভূমিতে উপন্যাসও উল্লেখযোগ্যভাবে আরও বড় অর্থে বৃহত্তর জীবনের সন্ধান দিয়েছে এবং তিনি তাতে যথেষ্টভাবে সফলও হয়েছেন, আমাদের আলোচ্য বিষয় তাঁর ছোটগল্প। তাই এবিষয়ে এবার আলোকপাত করব। বাংলা কথাসাহিত্যে দেবেশ রায় আজ একজন সুপ্রতিষ্ঠিত নাম এবং তাঁর সাহিত্যকৃতির ব্যাপ্তি যথেষ্ট আলোচনা ও সমাদরের বিষয়। এ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে যে ধরণের আলোচনা লক্ষ করেছি, তাতে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ থেকে যায়। কেননা, একজন গল্পকার তাঁর নির্মাণের মধ্য দিয়ে যে চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করেন, যে বিষজ্বালা সময়ের অসম্ভব দায় মেনে ইচ্ছাকৃতভাবে কণ্ঠে ধারণ করেন সেই জায়গা থেকে তার কঠোর থেকে কঠোরতর দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর স্বরূপকে উপলব্ধি করার মতো আলোচনা বড় প্রয়োজন। হয়তো দেবেশ রায়ের ছোটগল্প প্রসঙ্গ ধরে তাঁর গল্পকে ধরার যত্নে তাঁকেও নানাভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে, তবে তা থেকে গেছে কোনো এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ হিসেবে বা দেবেশ

রায়ের ছোটগল্পকে একটু স্পর্শ দিয়ে। দেবেশ রায় এবং তাঁর ছোটগল্পকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ দিনের শূন্যতা পূরণের প্রচেষ্টা নিয়ে চর্চায়ও হয়েছে কম-বেশি। তবে, এ আলোচনায় গল্পকার দেবেশ রায়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ফলে, গবেষণা পত্রের শিরোনামও অনেক ভেবেচিন্তে রাখা হয়েছে। যাতে গল্পের মধ্য দিয়ে নানা দেবেশ এবং দেবেশের মধ্যদিয়ে এক বা একাধিক গল্পগুলিকে খুব কাছ থেকে স্পর্শ করা যায়। সর্বোপরি একটা স্পষ্ট অবয়ব তৈরি হয়। সেই অবস্থান থেকে এই গবেষণা পত্রের ক্ষুদ্র সূচনা প্রচেষ্টায় দেবেশ রায়ের ছোটগল্প শিরোনাম 'দেবেশ রায়ের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিক'। দেবেশ রায়কে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার তাগিদ থেকে স্বভাবতই বেশ কিছু অধ্যায় বিন্যাসও করতে হয়েছে। এখানে সময় ও সৃষ্টির কালক্রম অনুযায়ী বিষয়ভাবনাও আঙ্গিকের দীর্ঘ অভিযান পর্ব তুলে ধরা হয়েছে। নীচে সারিবদ্ধভাবে 'দেবেশ রায়ের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিক' গবেষণা প্রকল্পটির অধ্যায় বিন্যাস তুল ধরা হল—

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : দেবেশ রায়ের ব্যক্তি জীবন ও সাহিত্যকৃতি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : দেবেশ রায় ও সমসাময়িক বাংলা ছোটগল্পকার।

তৃতীয় অধ্যায় : দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের ক্রম বিবর্তন।

চতুর্থ অধ্যায় : দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাজন ও বিষয় ভাবনার পর্যালোচনা।

পঞ্চম অধ্যায় : দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের আঙ্গিক ও গঠন কৌশল।

উপসংহার।

অধ্যায় বিন্যাসের এই অবয়ব থেকে 'দেবেশ রায়ের ছোটোগল্প : বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিক' চিত্রটি ধরার চেষ্টা করেছি। তবে একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, কোন রচয়িতাকেই সমালোচনা করে বোধহয় যথার্থভাবে তার স্বরূপকে অঙ্কণ করা যায় না। কারণ দারুণ দুর্বিপাকে তাঁর মন থেকে কেমনভাবে খেলে যায় এক-একটি গল্প, তার অদৃশ্য ভরা মনে তা তো জানা যায় না। বিবর্তনের দিনক্ষণ মিলিয়ে বা গল্পের আবেদন যাইহোক তাঁর নির্মাণের বেদনা তো তিনিই একমাত্র ভাল করে জানেন। হয়তো গল্প বলার সময়

বেদনাকে নানাভাবে ব্যবহার করেন গল্পের প্রাণে। যাইহোক, দেবেশ রায়ের ক্ষেত্রেও একথা সত্যি, কারণ ছাত্র জীবনে রাজনীতির প্রভাব তাঁর প্রথম গল্প লেখার পরিবেশে ধরা পড়ে নি। তাই আলোচনায় তাঁরই ভাবনার সূত্র ধরে বিশেষভাবে তাঁর আলাদা-আলাদা করে অনেক যত্নের সহিত গল্পগুলির মূল আবেদনের কাছাকাছি পৌঁছে রূপ ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রত্যেকটি অধ্যায় বিন্যাসের বিষয়-বস্তু ও আবেদন ভিন্ন হওয়ায় গল্পের সূত্র বা পরিস্থিতি অনুযায়ী আলোচনার ধরণও কখনও কখনও পরিবর্তন করতে হয়েছে।

সংক্ষেপে তুলে ধরব কোন অধ্যায়ে কী বিষয়ে কী ধরণের আলোচনা এই গবেষণা প্রকল্পের আলোচিত হয়েছে। যেমন—

ভূমিকা : ভূমিকাংশে উল্লেখ করেছি বাংলা ছোটোগল্পে ক্রমবিবর্তনের ধারায় গল্পকার দেবেশ রায়ের আগমন পর্ব এবং কীভাবে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত একজন প্রকৃত রচয়িতা হয়ে ওঠার জন্য সাহিত্য জীবন ক্ষয় করেছেন। ইতিহাস ও মানুষ বিশেষ সময়ের দাবি মেনে স্বাক্ষর রেখে যায়, রেখে যায় উচ্চারিত কিছু কণ্ঠস্বর। হয়তো একটি মানুষের সাথে আর একটি মানুষের বোধ ও দর্শনে ফারাক অনেকটা, তবে দেবেশের নিজস্ব পৃথিবীর ব্যক্তিগত নির্মাণে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, ইতিহাসকেন্দ্রিক। ইতিহাসের ঐতিহ্য হাতড়ালে যাদের স্পষ্টভাবে ইতিহাসেরই মানুষ বলে মনে হয়। এখানে বলা দরকার যে, তাঁর প্রথম জীবনের বর্ণময় যাপন একটা মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাস ও মানুষ এই দুটি বিষয়ের যোগসূত্র স্থাপনে তাঁর গল্পকার সত্তা (উপন্যাস বা অন্যান্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও) আশ্চর্য দক্ষতায় নির্মাণ করেছে সৃষ্টির অনুশীলন । একটি বিন্দু থেকে বিশ্ববা কখনও একটি ব্যক্তি থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অতীত ও ঐতিহ্য রচনায় তাঁর দায় চলমান থেকেছে সর্বদা।

সংকট ব্যক্তির, সংকট সময়ের, সংকট ইতিহাসের—এই যে তিন রকমের বিষয়ের কথা উঠল তাতে মনে হতে পারে, কোনো উপন্যাসের বিশেষ তিনটি অবস্থা। গল্পকার ছোটোগল্প, গল্প বা উপন্যাসের হিসেবটাকে গুলিয়ে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেধে রেখে অনেকটা কৃত্রিম প্রজননের ন্যায় কোনো সাহিত্যের যথার্থ উৎপত্তি হয় না, অসম্ভব। ফলে তাঁর একটি ছোটগল্প অনেক সময় অদৃশ্যভাবে উপন্যাসের সারমর্মকে স্পর্শ করে। যাইহোক, যে তিন সংকটের কথা হচ্ছে, তার মূলে রাজনীতির একটা

অবদান লক্ষ করি। বিপন্ন অস্তিত্বে ভঙ্গুর শেকড় আরও যখন বিপন্ন তখন রাজনীতির প্রকোপ সেখানে উপস্থিত। পুলিশ-প্রশাসন, ক্ষমতার অপব্যবহার স্বাভাবিকতার গতিপথ বদলে বিপন্ন অস্তিত্বের চড়া বাস্তবতায় পৌঁছে দেয়। সেখানে অবধারিতভাবে মৃতপ্রায় জীবনের বিপন্নতা প্রত্যক্ষ হয়। দেবেশ রাজনীতির গোপন কৌশল গোপন রং বদলানোর রূক্ষ্ম দুনিয়া থেকে সরাসরি গল্পের দুনিয়ায় দেখে দেন সাহসী বৃত্তান্ত। এই বিপন্নতা তাঁর কল্পনা জগতের থেকে ইতিহাসের চলমানতায় বেশি করে নির্ভরশীল। প্রথমেই বলেছি তাঁর প্রথম জীবনের রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন বিশ্বাস, বস্তুবাদী দর্শন, কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি বিষয়গুলি তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন ফলে রং-মাংসের ন্যায় একটা জীবন্ত প্রাণ তাঁর বিপন্ন জীবনকেন্দ্রিক ছোটগল্পগুলিকে আরও বেশি করে জীবনের কাছাকাছি পৌঁছে দিতে পেরেছে। বিপন্ন ইতিহাসের সম্পর্কসূত্র তাই তাঁর গল্পে অপরিণত বলে মনে হয় নি। সম্পর্ক সূত্রের ধারাকে এগিয়ে গেছেন যথেষ্ট দক্ষতার সাথে।

ইউরোপীয় সাহিত্যচর্চার মোহে প্রলুব্ধ হয়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-শরৎ-তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতির হাতে বাংলা ছোটগল্প সমৃদ্ধ হয়েছে এবং বাংলা ছোটগল্প যে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারেও আজ সর্বজন স্বীকৃত।

প্রথম অধ্যায় : 'দেবেশ রায়ের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন' এখানে আলোচিত হয়েছে তাঁর জন্মের বৃত্তান্ত ও তাঁর পারিবারিক পরিচয়। বাংলাদেশ থেকে খুব শৈশবেই জলপাইগুড়িতে স্থান পরিবর্তনের ইতিহাস। বিদ্যালয় জীবন, উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় আগমন—সবশেষে কর্মসংস্থান সূত্রে আবার জলপাইগুড়িতে ফিরে আসার পুনরাবৃত্তি। এই সময় অধ্যাপনার পাশাপাশি কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী হিসাবে জলপাইগুড়িতে তাঁর উপর নেতৃত্বের ভার পড়ে। ১৯৭৫ সালে কলকাতায় পুনরায় নতুন কাজের সূত্রে আসেন এবং 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্স' এ যোগ দেন এবং স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকাতে শুরু করেন। এবং এ যাবৎ কলকাতায় স্থায়ীভাবে রয়েছেন। এ সময় 'প্রগতি লেখক সংঘ' ও 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক রূপে তিনি নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সালে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন তিনি 'হাড়কাটা' গল্পটি লিখে সবার নজরে আসেন। গল্পটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এককভাবে এই 'হাড়কাটা' গল্প দিয়ে তাঁর সাহিত্য

জীবনের পথ চলা শুরু এবং এযাবৎ তিনি এখনও পর্যন্ত অবাধ গতিতে লিখে চলেছেন। এরপর দীর্ঘ কয়েক বছর তিনি শুধু ছোটগল্পই অবিরাম লিখে গেছেন। সাহিত্যচর্চায় স্বাদ বদল ঘটিয়ে উপন্যাস চর্চাতেও মনোনিবেশ করেন। ১৯৮৮ সালে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' লিখে বাংলা সাহিত্যে বিরাট সাড়া ফেলে দেন। এ জন্য তাকে 'সাহিত্য একাডেমি' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ১৯৮৯ সালে পান 'ভুয়ালুকা' পুরস্কার। যাইহোক, ব্যক্তিজীবনের বৃত্তে সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পর্বটি তাঁর সাহিত্যচর্চার কাল অনুযায়ী এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : 'দেবেশ রায় ও সমসাময়িক বাংলা ছোটগল্পকার'। দেবেশ রায়ের ছোটগল্প আলোচনার পূর্বে আলোচনা করেছি তাঁর সমসাময়িক ছোটগল্পকারদের গুরুত্বপূর্ণ সময় ও রচনার বিশেষ দিকটি। যেমন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎ, তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বা বেশ কয়েকজন অগ্রজ গল্পকারদের আলোচনা প্রয়োজন দেবেশ রায় এবং তাঁর সমসাময়িক গল্পকারদের একটি বিশেষ অবস্থা নির্ণয় করতে। সেখানে জলবায়ুগত প্রভাব ও প্রতিকূল পরিস্থিতি বিষয়ে আলোকপাত থেকে দেখানো গল্পকারদের উত্থান পর্ব। এখানে তেমনি দেবেশ রায়ের গল্পের একান্ত ব্যক্তিগত ঘরানার আরও কাছাকাছি পৌঁছুতে সমসাময়িক গল্পকারদের গল্প নিয়ে আলোকপাত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক একই সময়ে একই আবহের আগ্নেয়গিরি থেকে জ্বলে ওঠার জ্বলন্ত দিনগুলি এখানে উপস্থিত করা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে হয়েছে। দেবেশ রায়ের সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধযায় (১৯৩৫-) জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প রচয়িতা। বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর বিবিধ সময়ের এক একটি স্বরচিত গল্প। বাস্তব জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে একটি আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা তাঁর ছোটগল্পের বিশেষ দর্শন। পঞ্চাশ পরবর্তী ছোটগল্পকারদের জোরালো মিছিলে তাঁর উত্থান সেদিনকার বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে বিশিষ্ট আসনের দাবি রাখে। কবিতায় যিনি বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীলের সাহিত্যের উপকরণ স্বভাবতই সংগৃহীত হয়েছে বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় আশ্রয় নেওয়া জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, কিন্তু পূর্ব বাংলায় স্মৃতি বিধুর

অতীতের প্রতিধ্বনি তাঁর রচনার একটি বড় আলোচনার অংশ। দুটি পথচলতি মানুষের কথনভঙ্গি, প্রাত্যহিক জীবনের রূপায়ণ এবং যৌবনের উৎসাহ, উত্তেজনা ও আবেগের খোলামেলা বিস্তার তাঁকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দিয়েছে। দেবেশ রায় ও অন্যান্য সমসাময়িক গল্পকারদের উত্থানের দিনগুলি থেকে শুরু করে পরবর্তী শেষ জীবন পর্যন্ত নানা জাতের গল্প তাঁর ভাবনা থেকে পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, 'হরিদাসপুরে গাছের ছায়ায়', 'দূর উদাস', 'মনীষার দুই প্রেমিক', 'মহাপৃথিবী', 'কঠিন প্রশ্ন', 'খরা', 'তাজমহলে এক কাপ চা' প্রভৃতি গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪ -) একজন জনপ্রিয় এবং কুশলী কথাশিল্পী। তাঁর ছোটগল্প বিষয়বস্তু ও ভৌগোলিক পরিবেশের অভিনবত্বের জন্য সমাদৃত। বিষয়বস্তুর মৌলিকতা, অভিজ্ঞতার ঘনত্ব এবং প্রকাশভঙ্গির সরলতা তাঁর কথাসাহিত্য তথা ছোটগল্পকে বিশেষ খ্যাতি দিয়েছে। 'তৃতীয় ভুবন', 'চর্যাপদের হরিণী', 'অশ্বমেধের ঘোড়া', 'কাছের যারা প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯)। রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত জীবনাভিজ্ঞতা, মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ভাবধারা তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে লক্ষ করা গেছে। ছোটগল্প পরিবেশন দক্ষতায় দীপেন্দ্রনাথের বিষয় নির্বাচনে নির্মাণনৈপুণ্য এবং সচেতন সমাজ চিন্তার স্পষ্ট ভাবধারা লক্ষ করা যায়। এখানে উল্লেখ্য, দেবেশ রায় 'দীপেন্দ্রনাথ রচনা সংগ্রহ প্রকাশ করেন ১৯৮৩ সালে।

সমসাময়িক এমন তাবড় তাবড় ছোটগল্পকাররা বাংলা সাহিত্যে দশকের পর দশক ধরে সাহিত্য অনুশীলন করে স্ব-স্ব মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন। তাঁদের সৃষ্টির পিছনে জীবনাভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে ভিন্নতার পথ তৈরি হয়েছে, ফলে খুব সহজভাবে সাহিত্যিক হিসাবে স্বতন্ত্র পথ নির্মাণে সফলও হয়েছেন। দেবেশ রায় সাহিত্যচর্চার প্রারম্ভেই যে কাজটা করলেন তা হল, তথ্যের ঘনত্ব গল্পের মধ্যে বেশি করে জুড়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। যাতে গল্প নিছকই শুধু গল্পের ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়ে না থাকে, তথ্যের ঘনত্বে সে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, তার মধ্যে ইতিহাসধর্মী চেতনা যেন গল্পের সচলতাকে তীব্রভাবে ধরে রাখে। এই জন্য সমকালীন একাধিক গল্পকারদের ভিড়ের মধ্যেও তাঁর গল্পে বাস্তবতা ও ইতিহাসধর্মী বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাঁর আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যত্র

'হাড়কাটা', 'উদ্বাস্তু', 'অনৈতিহাসিক', 'কয়েদখানা' প্রভৃতি গল্পে সক্ষ্ম বিশ্লেষণের গভীর বুননে খুব যত্নের পরিচয়। কল্পনায় আঁকা গল্পের সারমর্ম যে বিষয়ই হোক বা যে কোনো গল্পেই থাকুক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সেখানে উপস্থিত। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে গল্পের মানকে তিনি সমসাময়িক কালে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে, গল্পের গভীরে উঁকি মারলে বোঝা যায় এটা দেবেশ রায়ের গল্প। অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেবেশ রায় একটা প্রভাব ফেলেছেন নিঃসন্দেহে বলা যায়। এবং প্রতীকধর্মী ভাষা। এমন নয় যে দেবেশ রায়ই প্রথম পঞ্চাশ পরবর্তী ছোটগল্পে প্রতীকধর্মী ভাষার প্রথম সার্থক স্রষ্টা, তারও বহু আগে চলে আসছে প্রতীক ধর্মী ভাষার যথার্থ প্রয়োগ। তবে, দেবেশ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পাশাপাশি মিশিয়ে দিতে পারতেন প্রতীকধর্মী ভাষাকে। সেখান থেকে সব গল্পকারদের থেকে ভিন্ন হয়ে ধরা দেয় দেবেশীয় প্রতীকধর্মী ভাষার অবয়ব। সমাজ সচেতন, তথ্যনির্ভর এবং বক্তব্য ধমিতাও তাঁর লেখক সত্তার একটি বড় পরিচয়। এই সমস্ত এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সাময়িক কালে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির আপন মহিমায় তিনি নিজস্ব গল্পকার সত্তার স্পষ্ট 'ইমেজ' তুলে ধরতে পেরেছেন। এবং বর্তমানকালেও তিনি একইভাবে সমাদৃত এবং বিশিষ্ট কথাশিল্পী হিসাবে পরিচিত হয়ে আছেন।

তৃতীয় অধ্যায় : দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের ক্রমবিবর্তন। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে দেবেশ রায়ের দীর্ঘ গল্প রচনার ক্রমবিবর্তনের ধারা। ১৯৫৫ সাল থেকে লেখা গল্পের সূত্রপাত থেকে বর্তমান কাল অবধি ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটি ধাপে ধাপে আলোচিত হয়েছে। গল্পকার স্বয়ং নিজে তাঁর গল্পগুলিকে এ পর্যন্ত ছ'টি খণ্ডে ভাগ করেছেন। একটি নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডী রেখে সেগুলিকে ভাগ করতে তাঁকে দেখা গেছে। যেমন ১৯৫৫-১৯৬১ সাল পর্যন্ত গল্পগুলিকে তিনি গল্প সমগ্রের প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ডে সর্বমোট ২১টি গল্প রয়েছে। সূচিপত্রে দেবেশ রায়ের একটি মূল্যবান ভূমিকাও এখানে উপস্থিত। প্রকাশকাল এই গল্পগুলিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকলেও কিছু কিছু প্রকাশকাল 'আনুমানিক' বলে মনে হয়। গল্পগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, যেমন— 'দেশ', 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়', 'পরিচয়', ' ছোটগল্প', 'মানস' ইত্যাদি। প্রথম খণ্ডে ক্রমবিবর্তনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গভীরে গিয়ে গল্পগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তেমনি স্মৃতি, একাকিত্ব, শূন্যতা নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের কথা তুলে ধরেছেন আলোচ্য

গল্পগুলিতে। নিজেকে গল্পকার হিসাবে অদৃশ্য ঘোষণা এবং ভূমিকাংশে উল্লিখিত আত্মভাবনা থেকে অনুমান হয় কোথাও একটা সাঙঘাতিক দায় থেকে তাঁর এই গল্পলেখক সত্তার অবতরণ।

'দেশ', 'পরিচয়', 'ছোটগল্প', 'কালান্তর', 'সম্প্রতি' প্রভৃতি পত্রিকায় 'গল্পসমগ্র' ২য়-এর গল্পগুলি প্রকাশিত। ১৯৬২-১৯৬৭ সালের মধ্যে লিখিত গল্পগুলিতে ২৯টি গল্প স্থান পেয়েছে। ক্রমবিবর্তনের এই ধারায় বাস্তবতার প্রসঙ্গ গভীর থেকে গভীর আকার নিয়েছে। সত্য ঘটনা অবলম্বনে ইতিহাস এসে ধরা দিয়েছে। এক অস্থির সময়ে দেবেশ রায় নিজে যেভাবে পদার্পণ করেছেন, তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ যেন ১৯৬২-১৯৬৭ সালের তুমুল সময়ে উথলে পড়তে দেখা যায়। গল্পগুলির আবেদনও তাঁর গল্পসত্তার ভেতর থেকে প্রকট হয়ে তাঁর সাথে হুবহুভাবে সুর মিলিয়েছে।

১৯৬৮ থেকে ১৯৭৭ -এর মধ্যে প্রকাশিত গল্পের তালিকায় মোট ১২টি গল্প রচিত। গল্পগুলি 'শারদীয় কালান্তর', 'পরিচয়', 'গল্প-কবিতা', 'অমৃত' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রাজনীতির রাজনৈতিক কৌশল মুহূর্তে মুহূর্তে রং বদলায় কীভাবে তার খনন এই গল্পগুলিতে দেখানোর প্রচেষ্টা আছে। চেনা বৃত্তের মধ্যে কুড়ে কুড়ে ভাগ্য স্থলনের পরিণতিও এই 'গল্পসমগ্র' ৩য় এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই পর্বের গল্পে দেবেশ রায়ের নান্দনিক চর্চার দিকটি ভালভাবে ফুটে ওঠে। বহু স্তরিক ভাষা বিন্যাসের ওপর তিনি নির্মাণ করে গেছেন গল্পের কাহিনি। তিনি বাস্তবজীবনে সাংবাদিকতার কর্মকে এক সময় গল্পের মধ্যে প্রয়োগ করলে গল্পগুলির রেখাচিত্রগুলিকে বদলে যেতে দেখা গেছে। ব্যক্তি মানুষের বন্দী জীবন থেকে মুক্তির খোঁজ অনুসন্ধানের অস্থির তৃষ্ণা যেমন লক্ষিত হয় তেমনি মুক্তির খোঁজ থেকে মুক্তি পেতে ব্যক্তিজীবনের একঘেয়ে মুক্তির বহু বিচিত্র অপরাধমূলক ভাবনাও গল্পগুলিতে আশ্রয় পেয়েছে। জীবনের চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে দেবেশের গল্প শোনানোর সাহসী অভিযান এই অধ্যায়ে অনেকটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করার মতো। রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার দৈনন্দিন চিত্র তার সাথে আইনের মনোযোগ বা নৈতিকতার পরিভাষা বুঝে ওঠা এ পর্বের গল্পগুলিতে কঠিন আকার নিয়েছে।

সম্মিলিতভাবে ১০টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় 'গল্পসমগ্র - ৪'। ১৯৭৮-১৯৮৬ প্রায় আট বছর ধরে গল্পগুলি লেখা এবং প্রকাশ হয়। গল্পগুলি 'শারদীয় পরিচয়', 'শারদীয়

বারোমাস', 'পরিচয় গল্পসংখ্যা', 'বারোমাস', 'শারদীয় যুগান্তর' ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় রচিত। মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবন ব্যক্তিজীবনকে গ্রাস করার তীব্রতা ধরা পড়ে। ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির পথভ্রান্ত জগৎ এখানে লক্ষণীয়। জন্মগত অধিকারের আপন জগৎ এ গল্পগুলিতে শেষ পযন্ত ভুলে ভরা একটি দীর্ঘ অভিশাপের দৃষ্টিতে দেখানো হয়েছে। দেখা যায় মূল্যবোধ ধসে পড়ার প্রকৃত কারণের উৎস। উৎসের রূপে ও স্বরূপে বিচিত্র জীবনের অচেনা-অজানা বৃত্তান্ত। নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম এবং পরিবর্তিত সামাজিক বাস্তবতার অন্দরে টানাপোড়েন, যাপিত জীবনের ধর্ম এবং যুগের চাহিদাকে দেবেশ রায় জানিয়ে দেন জীবন-যুগ-স্মৃতি ও সত্তার বৃহত্তর পৃথিবী।

১৯৮৭ থেকে ১৯৯৪ এর মধ্যে প্রকাশিত গল্পের তালিকায় 'গল্পসমগ্র -৫' -এ মোট ১৭টি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পগুলি 'আজকাল', 'বারোমাস', 'মুখের দরদাম', 'গল্পপত্র', 'মিরান্দা', 'কালান্তর' পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। অবলম্বন নিয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছে নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় প্রত্যেকটা মানুষ। এবং অবলম্বন হীনতা নিয়ে বাঁচতে চায় না কেউ-ই। ফলে তাঁকে ঘিরে ধরে শূন্যতা-একাকিত্ব। আর এই একাকিত্ব নিয়ে রক্ত-মাংসহীন জীবন অতিক্রম করার তিক্ত অভিজ্ঞতা ঝড়ে পড়ে কীভাবে তার দর্শন ধরা পড়েছে। স্মৃতি-বিস্মৃতির প্রসঙ্গ তখনই উপস্থিত হয় যখন অনুভূতি অনুশীতিল হয় মনের গভীরে। সেখান থেকে কোন এক ধূসর অতীতও আছড়ে পড়ে অনুভবের দরজায়। আবার স্মৃতির স্মরণে এক স্মৃতিকে ফেলে আর এক স্মৃতি চাপা পড়ে যায়। মানুষের ব্যক্তিগত নিজস্ব জগৎ নানারকম ভাবনা নিয়ে পাড়ি দেয় সময়ে-অসময়ে তার ইচ্ছের জগৎকে কেন্দ্র করে। সেখানে আলোর ন্যায় মুহূর্তে মুহূর্তে পৌঁছে যায় তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিমন। তাঁকে তখন সেই আশ্রয়ে যন্ত্রণা পেতে দেখা যায়, সুখ অনুভব করতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের স্বভাবের আবরণ ভেঙে দেবেশ নিয়ে যান আবরণ ভাঙা সেই নিজস্ব ব্যক্তিগত জগতের ঠিকানায়। এছাড়াও সময়োপযোগী গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছায়া লক্ষ্য করা যায় বেশ কিছু গল্পে।

নয়টি গল্পের সম্ভার নিয়ে প্রকাশিত হল তাঁর 'গল্পসমগ্র - ৬'। ১৯৯৫-১৯৯৮ সালের মধ্যে এই গল্পগুলি লিখেছেন গল্পকার। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই গল্পগুলিকে প্রকাশিত হতে

দেখা যায়। যেমন—'বারোমাস', 'কালান্তর', 'পরিচয়', 'দেশ', 'প্রমা' ইত্যাদি। গল্পের কনটেন্ট এর গল্প বলার ভাঁজ তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলিতে যেভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে তাতে ষষ্ঠ খণ্ডে এসে গল্পের ভাষা-ভাবনা বদলে গেছে অনেকটা। দেবেশ রায় যে ততদিনে একজন প্রতিষ্ঠিত গল্পকার এই গল্পগুলিতে তেমনভাবে নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই। দেবেশ রায় যে ধরণের গল্প লিখতে অভ্যস্ত তাতে তাঁর স্পর্শ পুরামাত্রায় এ গল্পগুলিতে রয়েছে। তবে আলাদা করে বলতে গেলে বলতে হয় উত্তরবঙ্গ যে তাঁর প্রথম জীবনের একটি বড় অধ্যায় এবং এখানে তিনি এ প্রকৃতির রূপরসগন্ধ মেখে বড় হয়ে উঠেছেন, তার প্রসন্ন উল্লেখিত আছে। উত্তরবঙ্গে অবস্থিত বিভিন্ন মানুষের বসবাস, তাঁদের সংস্কৃতি এই খণ্ডে তিনি আপন মমতায় আলোকপাত করেছেন। ফলে চেনা উত্তরবঙ্গের ভেতরে আরও বর্ণময় উত্তরবঙ্গ ধরা পড়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তিনি যেন ক্ষেত্রসমীক্ষার বেশে তাঁদের জীবনের পর্বগুলিকে ব্যাখ্যা করছেন। তাঁদের বহমান জীবনের দিনলিপি দেবেশ রায়ের ছোটোগল্পে সত্যি অসামান্য হয়ে উঠেছে।

গবেষণা প্রকল্পের অধ্যায় বিভাজনে এতক্ষণ ধরে যে অধ্যায়গুলি আলোচিত হল, তাতে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের পারস্পরিক সংযোগ এবং ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যায় বিন্যাসের বিধিলিপি অনুযায়ী তাতে ধীরে ধীরে দেবেশ রায় এবং তাঁর ছোটোগল্পকে উপলব্ধি করার একটা অবয়ব গড়ে উঠেছে। এবার চতুর্থ অধ্যায়ে প্রবেশ করলে সেই অভিযান অনেকটা তার লক্ষ্যে পৌঁছবে বলে মনে করি।

চতুর্থ অধ্যায় : দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাজন ও বিষয়ভাবনার পর্যালোচনা।

' শ্রেণিবিভাজন ও বিষয়ভাবনা' একটু তলিয়ে আলোচনা করলে তার বেশ কয়েকটি অণু-অধ্যায় তৈরি হয়। সেগুলি ছাড়া আলোচনাটি অসম্পূর্ণ বলে মনে হবে। যেমন—

ক. মনস্তত্ত্বমূলক ছোটগল্প

খ. রাজনৈতিক বাতাবরণমূলক ছোটগল্প

গ. সমাজ চেতনামূলক ছোটগল্প

ঘ. অর্থনৈতিক সংকটমূলক ছোটগল্প

ঙ. দাম্পত্য জীবনমূলক ছোটগল্প

চ. নৈতিক চেতনার হ্রাস, মূল্যবোধহীনতা ও হতাশার গল্প

ছ. বিবিধ।

ক. মনস্তত্ত্বমূলক ছোটগল্প : মানুষের সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব বোধহয় আরম্ভ হয় তার নিজেরই সাথে। এবং অন্য কোন মানুষের সঙ্গে বা কোন পরিস্থিতির চাপে তৈরি হয় মনস্তত্ত্ব। স্বভাবতই, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বুনন তাঁর বর্ণময় দিক লেখক জীবনে নানান অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে। ব্যক্তির সংঘাতের জন্য ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা বিবিধ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এখানে লক্ষণীয়। সমাজের বসবাসকারী ব্যক্তির চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে হতাশা, যন্ত্রণা নৈতিক চেতনাহীনতাকে তিনি মনস্তত্ত্বের ছাঁচে ভাষা দিয়েছেন। ফলে তাঁর নিজস্ব গল্প উপস্থিত করার কলাকৌশলে গল্পে মনস্তত্ত্বের নতুন দৃষ্টিকোণ রূপ লাভ করেছে। মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের মধ্যে'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা', 'হাড়কাটা', 'পা', 'কলকাতা ও গোপাল', 'জলধর ব্যানার্জির মৃত্যু', 'দুপুর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খ. রাজনৈতিক বাতাবরণমূলক গল্প : রাজনৈতিক আবহ নিয়ে গল্পের যাত্রা শুরু ষাটের দশক থেকে। দেবেশ রায় ব্যক্তি জীবনের রাজনৈতিক আদর্শে প্রবলভাবে উদ্বদ্ধ হয়েছিলেন ছাত্রজীবন থেকেই। ফলে রাজনৈতিক ছাঁচে গড়া গল্পগুলিতে লেখকের তত্ত্ব, কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এবং প্রত্যয়ে তিনি নিজের দর্শনকে বিস্তার করতে পেরেছেন। রাজনীতির অর্থ তাঁর কাছে দৈনন্দিন জীবনের ভিতর এক স্বপ্নের সঞ্চার ও সেই স্বপ্নকে দৈনন্দিন করে তোলার অনবরত ইচ্ছা থেকেই তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন। রাজনীতির নিবিড় চলমানতা তাঁর গল্পে নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। ক্ষমতাসীন রাজনীতির শিকার হয়ে সাধারণ মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়ে—তার চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। একজন ব্যক্তির মৃতদেহ নিয়ে নোংরা রাজনীতির চূড়ান্ত সীমা এক জায়গায় না থেমে শুধু ভোগাতে থাকে ওই লাশের সাথে জড়িত আত্মীয়-স্বজনদের। এমন নির্মম ও সাহসী গল্প লিখতে দেবেশ দ্বিধা করেন নি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দূরত্ব দেবেশের অনেক গল্পেই প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্রুপের ভঙ্গিতে তাই অনেক রাজনৈতিক বাতাবরণমূলক গল্প লেখা হয়েছে। যেমন—'উদ্বাস্তু', 'মানুষরতন', 'রাষ্ট্রপতির শাসনে', 'নিরস্ত্রীকরণ কেন', 'ক্ষয় ও তার প্রতিকার', 'মৃত জংহন ও বিপজ্জনক খাট', 'আমিষ নিরামিষ', 'কয়েদখানা'

প্রভৃতি।

গ. সমাজ চেতনামূলক গল্প : সমাজ চেতনামূলক গল্পে সমাজের স্বরূপ তুলে ধরার পাশাপাশি বাস্তবতার রূপটিও তুলে ধরেছেন। অনেকটা সমীক্ষা এবং গবেষণায় ছায়াপাত ঘটেছে এই পর্বের কিছু কিছু গল্পে। সর্বোপরি সমাজ বাস্তবতার সামগ্রিক চিত্র বললে যে অবয়ব ধরা পড়ে একটি গল্পে তার বিচিত্র দিক এখানে লক্ষ্য করা যায়। 'ভয়', 'দুপুর', 'উদ্বাস্তু', 'গীতাল', 'যুগীনের টেকনোলজি গ্রহণ', 'অনৈতিহাসিক', 'স্বপ্নজাগরণের ব্রত', 'অন্ত্যেষ্টির রীতিবিধি' ইত্যাদি সমাজভাবনা নির্ভর গল্পগুলি আলোচিত হয়েছে।

ঘ. অর্থনৈতিক সংকটমূলক গল্প : সংকট থেকে মনস্তত্ত্ব, রাজনৈতিক, সমাজ সমস্যার পথ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হয় যদি অর্থনৈতিক সংকট এসে তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে মানুষের স্বাভাবিকতা ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়। সেই ক্ষয় তিলে তিলে নিয়ে যায় কখনও মানবিক অবক্ষয়ের দিকে কখনও আত্মহত্যা প্রবণতার দিকে। 'আত্মসচেতনতার ফাঁকফোকর' (১৯৯০), 'কলকাতা ও গোপাল' ইত্যাদি গল্পগুলিতে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট প্রকাশিত হয়েছে।

ঙ. দাম্পত্য জীবনমূলক ছোটগল্প : দুটি নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সম্পর্কের বহুবিধ স্তর থেকে নেমে আসে দাম্পত্যের বিচিত্র প্রকাশগুলি। সম্পর্ক দুটি মানুষের বসবাসে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুখ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দুঃখ এসে হাজির হয় আবার জটিলতা নিয়ে দুরাশা বয়ে চলতে গিয়ে দেখা মেলে আনন্দের। দাম্পত্য জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তর যে জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, গল্পগুলিতে তার সুস্পষ্ট হদিশ পাওয়া যায়। 'ইছামতী', 'অসুখ' প্রভৃতি গল্পগুলিতে দেবেশ রায় দাম্পত্য জীবনের বর্ণময় দিক ফুটিয়ে তুলেছেন।

চ. নৈতিক চেতনার হ্রাস মূল্যবোধহীনতা হতাশার গল্প : সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার ফলে এই ধরণের গল্পগুলি তৈরি হয়েছে। অবিচ্ছিন্ন বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এলোমেলো জীবনে পদার্পণ এবং সেখান থেকে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাই যেন এ ধরণের গল্পে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়। সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি ক্ষোভ, বিদ্বেষ এবং তা থেকেই ভিত্তি হতাশার সূত্রপাত এ পর্বে উল্লেখিত। 'হাড়কাটা', 'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা',

'কলকাতা ও গোপাল' প্রভৃতি গল্পে এ জীবনাভিজ্ঞতা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। দেবেশ রায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা পালন করতে সমর্থ হয়েছেন।

ছ. বিবিধ :

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, দাম্পত্যমূলক সমস্যা বিষয়গুলি দেখানোর পর মনে হতে পারে গল্পকার দেবেশ রায়ের নতুন করে নতুনভাবে আর গল্পে দেখানোর কিছু নেই। কেননা, উল্লেখিত বিষয়ের উপর দেবেশ রায় যেভাবে গল্পের গভীরে গিয়ে গল্প পরিবেশন করেন, তাতে একদিক থেকে মনে হয় তিনি গল্পের জন্য পুরো জীবনকে সঁপে দিয়েছেন। কিন্তু 'বিবিধ' পর্যায়ের গল্পগুলিতে মনোনিবেশ করলে সেই ধারণা ভেঙে যায় ক্ষণিকের মধ্যে। বিবিধ পর্যায়ে দেবেশ নিজেকে বারবার ভেবে নানারূপে ধরা দিয়েছেন। বৈচিত্রে ভরা গল্পগুলির ভেতর তিনি নিজেই নিজেকে প্রতিবার অতিক্রম করে গেছেন। 'বিবিধ' পর্যায়ের গল্পগুলি আপাত অর্থে মনে হতে পারে এ গল্পগুলি কোন একটি বিশেষ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এগল্পগুলির প্রকৃত অবস্থান বিবিধ পর্বেই। আত্মভাবনা, আত্মদ্বন্দ্বের বশবর্তী হয়ে কিছু কিছু মানুষ নিজেই যখন বেঁচে থাকার সংবিধান তৈরি করেন, সেখানে লক্ষ্য করা যায় ভুলে ভরা সংবিধানের একটি দীর্ঘ তালিকা। একটি সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে পৌঁছনোর চাহিদা তাদের জীবনে থেমে গিয়ে উঠে আসে একাকিত্বের লোভনীয় মায়াজাল। আর সেখান থেকেই স্বাভাবিক জীবনযাপনের ছন্দপতন। দেখা মেলে অর্থহীন জীবনের নির্দিষ্ট ঠিকানা। বিজ্ঞাপন জগতের বদলে যাওয়া ভাষায় মানুষ নীরব ভদ্রতার ছলে হয়ে উঠছে হিংস্র, রক্তাক্ত। নতুন প্রজন্ম প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান আহরণে বিজ্ঞাপনকে অসতর্কভাবে মিশিয়ে ফেলছে জীবনের সাথে। অথচ কোনটা ভাল কোনটা ক্ষতিকর তার নির্ণয় ক্ষমতার বিলোপ ঘটছে নৈতিক চেতনা থেকে। মানুষ তার পশুত্ব সব সময় যে তার নিজের উপরই প্রয়োগ করে এমন নয়, সে কোনো একটি পশুর চাল-চলনের ভেতর খুঁজে নেয় আদিমতার গোপন পাঠ। আবার অমানবিকতার সর্বনিম্ন স্তরে মানুষ পৌঁছে যায় একাধিক হীন কর্মের গন্তব্যে কিন্তু পরিস্থিতি সুযোগ দেয় তাকে মানবিকতার সত্যিকারের পথে পা মেলাতে। বিভিন্ন ধরণের গল্প বিভিন্ন মেজাজে তাঁকে লিখতে দেখা গেছে। সেগুলিকে খুব সহজেই কোন একটি অধ্যায়ে জুড়ে দেওয়া যায়

না, কারণ সেগুলির অধ্যায় বিন্যাস একেবারেই আলাদা পর্যায়ে পড়ে। যাইহোক, বিবিধ অনুষঙ্গে দেবেশ রায় এক একটি গল্পে এক একরকমভাবে ধরা দিয়েছেন; যা কিনা কোনো গল্পের সাথে কোনো গল্পের মিল নেই।

পঞ্চম অধ্যায় : দেবেশ রায়ের গল্পের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল। ১৯৫৫ সাল থেকে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরে সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছেন গল্পকার দেবেশ রায়। দীর্ঘ এত বছর ধরে গল্প লেখার দক্ষতা নিয়ে আর নতুন করে বলার কিছু নেই। যা চর্চার মধ্যে পড়ে তা হল, তাঁর গল্পের রীতি-নীতি, বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক ও গঠনকৌশল। 'আঙ্গিক ও গঠনকৌশলে'র দিক থেকেও দেবেশ রায় বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে আলাদাভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর গল্পের কনটেন্ট যে পর্যায়ের তাতে আঙ্গিক ও গঠনকৌশলেও উচ্চ পর্যায়ের একটা ধারা তিনি অতি সহজেই তৈরি করতে পেরেছেন। গল্পের মূল সুরটিকে ধরিয়ে দিতে কোনো কোনো সময় তিনি প্রতিধ্বনির মতো কোনো কোনো বাক্য বা শব্দকে কয়েকটি পরপর সাজানো বাক্যের মধ্যে খুব সচেতনভাবে ব্যবহার করতেন। আবার কবিতার মূল আবহ গল্পের শরীরে অনায়াসে সঁপে দিতে পারতেন। আঙ্গিক ও গঠনকৌশলের দিকগুলো গল্প জীবনের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত অবধি এমন সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করেছেন যেন প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে শৈল্পিক আবেদন পরিপূর্ণরূপে ধরা পড়ে। শব্দচয়ন, ভাষাগঠন, বাক্যের যথার্থ ব্যবহার, উপমা সংযোগে নিজস্বতা ইত্যাদি বিষয়গুলিতে তাঁর দক্ষতা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

পঞ্চাশের দশকের লেখক ও রচিত গল্প নিয়ে সেদিকার পঞ্চাশ পরবর্তী বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে দেখা দিয়েছিলেন অনেকেই। বস্তুত সব গল্প এবং গল্প লেখকই যে সমানভাবে শিল্প কৃতিত্বে উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছেন এমন নয়, তবে পঞ্চাশের দশকে লেখক হয়ে লেখা চালিয়ে যাওয়ার স্পর্ধা দেখিয়ে অনেক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষত, গল্পের বিষয় রীতিতে একটা মোড় যাতে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তার প্রচেষ্টা করে গেছেন নিরলসভাবে। দেবেশ রায় সাহিত্যিক জীবনে স্বাক্ষর রেখেছেন পঞ্চাশের দশকেই। তাঁর গল্প রচনার ভঙ্গি দশকের পর দশক ধরে চলছে, তাতে হয়তো বদল এসেছে, আসাটাও খুবই স্বাভাবিক। কেননা, জীবনের চলার পথ তাঁকেও অতিক্রম করতে হয়েছে ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর। তবে, কোনো অবস্থাতেই সাহিত্য চর্চার মূল স্রোত থেকে তিনি হারিয়ে

যান নি। কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে তিনি সাহিত্যের আসনে তাঁর নামটা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

বিশ শতকের গোড়া থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রাজনৈতিক আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নৌবিদ্রোহ প্রভৃতি একের পর এক অবক্ষয় ধারাবাহিকভাবে ঘটে গেছে এ সময়। পঞ্চাশ পরবর্তী সংকটগুলো তাই পূববর্তী অবক্ষয়ের হাত ধরে এসেছে। ফলে দেবেশ রায় খুব স্বভাবতই লক্ষ করেছেন সমকালীন রাজনৈতিক সংকট, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা। পঞ্চাশ পরবর্তী সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে তাঁকে দেখা গেছে যুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটমূলক গল্প লিখতে। অবক্ষয়িত নতুন প্রজন্মের দিনযাপন, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের দুর্বিষহ জীবন, দাম্পত্য সংকটের বিষয়গুলিকে তিনি গল্পের আকারে হাজির করেছেন। পঞ্চাশ পরবর্তী সংঘাত শেষ না হওয়ার অভিজ্ঞতা বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

কিশোর থেকে যুবক, বিভিন্ন ধরণের নরনারী থেকে বৃদ্ধ মানুষের জীবন রূপায়ণে তিনি ভিতরে ভিতরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। পঞ্চাশের দশক হতে পুনরায় গল্পের শিল্পকৌশল পরিবর্তিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পঞ্চাশের দশকের গল্পকারদের মধ্যে আজ আর অনেকেই বেঁচে নেই। আবার এ দশকের কিছু গল্পকার এখনও পর্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে গল্প রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। গল্পকার (কথাসাহিত্যিক) দেবেশ রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আধুনিক যুগের গতির সঙ্গে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছেন। দীর্ঘ জীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতা আজও তাঁর এক-একটা গল্পে অনুপ্রেরণা দান করে। পঞ্চাশের দশকে তাঁর সাহিত্যযাত্রার সাথে অনেকেই সঙ্গী হয়েছিলেন। তাতে গল্প বলার ভঙ্গিতে কিছু সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যে মিলও রয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই দেবেশ রায় স্বতন্ত্রভাবে গল্পে নিজস্ব চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। আর এই দশকের বিলম্বিত গল্পকারগণ কিছুটা হলেও তাঁকে অনুসরণ করেছেন। এই চলমানতার গতিপথে বর্তমান যুগের পাঠকদের অনুধাবণ করে গল্পকার দেবেশ রায় দীর্ঘকাল গল্প লিখে নিজস্ব ভুবন তৈরি করেছেন তার যথাযথ চর্চা ও গবেষণা একটি বিশেষ ভূমিকা দাবি করে বলে মনে করি। এবং সেই অবস্থানে দাঁড়িয়ে এই ক্ষুদ্র ভূমিকা পুনরায় সেই বিষয়ে আলোকপাতের আয়োজন রেখে দেয়।